দিনে রোদ
রাতে জল
তাতে বাড়ে
ধানের বল

চাষের কথা

শ্রাবণের
পুরো
ভাদ্রের বারো
ধান্য রোপণ
যত পারো

বর্ষ ১৩ ।। সংখ্যা ৩ ।। মে-জুন ২০১০ ।। ১৭ বৈশাখ - ১৫ আষাঢ় ।। ১৪১৭

সাইকেল লাঙল কৃষিরাজা

দ্রুত জমির পরিমাণ কমছে, একর প্রতি আয় কমছে, চাষির টাকাপয়সার অভাব ইত্যাদি সমস্যায় চাষির চাষের প্রতি বিশ্বাস কমে যাচ্ছে।

চাষে প্রধান কাজগুলির মধ্যে জরুরি হল জমি চষা এবং আগাছা নিড়োনো। কিন্তু বলদ রেখে চাষ বা ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষের খরচ ও প্রতিদিন বাড়ছে।

কিন্তু বসে থাকলে তো চলে না। তাই চাষিরা সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কীভাবে চাষের খরচ কমানো যায়। আর এই কথা ভাবতে ভাবতেই মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার চাষি গোপাল মালহরি ভিসে বানিয়ে ফেলেছেন কৃষিরাজা নামের জমি চষা ও আগাছা নিড়োনোর যন্ত্র।

০.৮ হেক্টর জমি চষা খুব সহজ কাজ নয়। এছাড়া জমিতে জলের ব্যবস্থা সহ সব কাজই আমার ও আমার স্ত্রী-এর করতে হয়। আমি মজুরের পয়সা দিতে পারি না। তাই আমি নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করি কম খরচে বিভিন্ন কাজ করার জন্য। এই ভাবেই সাইকেলের সামনের দিকের অংশ দিয়ে আমি বানিয়েছি কৃষিরাজা।

কৃষিরাজার প্রধান অংশগুলি হল সাইকেলের হ্যান্ডেল, সামনের দিকের অ্যাক্সেল (যা চাকাটিকে ধরে রাখে) ও চাকা। অ্যাক্সেলের সঙ্গে লাগানো থাকে একটা স্টিলের ফর্ক যার নিচের দিকে জমি চষা, আগাছা নিড়োনো ও মই দেওয়ার জন্য নাট ও বল্টু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফলা বা পাত লাগানো হয়।

এছাড়া কাজগুলি করার সময় যাতে চোট না লাগে, তার ব্যবস্থাও করা আছে এই যন্ত্রে।

শ্রী ভিসে বলেন, কৃষিরাজা মাঝারি ধরনের শক্ত মাটির একফুট গভীর করে চষতে পারে। আমি তো জমিচষা, নিড়ানি, মই দেওয়া — সব কাজই কৃষিরাজা দিয়ে করি। এখন আমার এলাকায় দুশোরও বেশি চাষি, যাঁদের বলদ নেই বা ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ করতে পারে না, তাঁরা কৃষিরাজা ব্যবহার করছেন। ১২০ টাকা দামের এই যন্ত্র দিয়ে একজন লোক ৬ বিঘা (১ বিঘা = ৩৩ শতক) জমিতে নিড়ানি দিতে পারে।

ছোট চাষির স্ব-নির্ভরতা সুস্থায়ী চাষের একটি প্রাথমিক শর্ত। কৃষিরাজার মাধ্যমে সহজেই তার দিকে কিছুটা এগোতে পারে চাষিরা।

হিন্দু ২৯ এপ্রিল ২০১০

এবিষয়ে আরো জানতে যোগাযোগ:

শ্রী গোপাল ভিসে, সেন্দুরনি, তালুকা : জামনের, জলগাঁও, মহারাষ্ট্র, ফোন : ০৯৯৭০৫২১০৪৪

ড. নিতিন মৌর্য, ফোন : ০৭৯ - ২৬৭৩২৪৫৬, ২৬৭৩২০৯৫ ■■

অন্য পাতায়

১০০ দিনের কাজে উদ্যানপালন ২
ছোট চাষির জমিতেও ১০০ দিনের কাজ ২
চুক্তি চাষ ৪
এ মরশুমের চাষ ৬
নটে শাক ৭

খাদ্যের অধিকার : সুপ্রিম কোর্টের আদেশ

প্রকল্পের নাম : অভীষ্ট গণবন্টন ব্যবস্থা (টিডিপিএস)

কাদের জন্য : সব বিপিএল পরিবার।

কী পাওয়া যাবে : প্রতিমাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল বা গম। পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি ৭ কেজি চাল বা গম। চালের মূল্য প্রতি কেজি ৬টাকা ১৫ পয়সা। গমের মূল্য প্রতি কেজি ৪ টাকা ৬৫ পয়সা।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : খাদ্যশস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। রেশন দোকান নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত (কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ দিন) খোলা রাখতে হবে। একাধিকবার খোলা বাজারে বিক্রি হলে বা রেশন সামগ্রী বিষয়ে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে অভিযুক্ত রেশন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হবে।

প্রকল্পের নাম : অন্নপূর্ণা

কাদের জন্য : বিপিএল পরিবারের ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে সহায়সম্বল নেই এরকম বয়স্ক এবং যাঁরা বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার উপযোগী অথচ সেই ভাতা পাচ্ছেন না।

কী পাওয়া যাবে : প্রতিমাসে বিনে পয়সায় ১০ কেজি চাল বা গম।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পাওয়ার যোগ্য অথচ বঞ্চিত সকলকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

প্রকল্পের নাম : মিড ডে মিল

কাদের জন্য : প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের (৬-১১ বছর বয়সীদের) জন্য।

কী পাওয়া যাবে : প্রতিদিন ১০০ গ্রাম চাল এবং ২ টাকা ডাল, মাছ, সবজি ইত্যাদি খাদ্যের জন্য।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : ৮-১২ গ্রাম প্রোটিনযুক্ত এবং ৩০০ ক্যালোরি খাদ্যগুণ সম্পন্ন রান্না করা খাবার, বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন দিতে হবে। দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রকল্পের নাম : অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা

কাদের জন্য : বিপিএল পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলির জন্য। গ্রাম সংসদের সভায় এই পরিবারগুলির তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে।

কী পাওয়া যাবে : পরিবার পিছু প্রতি মাসে ৩৫ কেজি চাল বা গম। পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতি ৭ কেজি চাল বা গম। চালের মূল্য প্রতি কেজি ৩ টাকা। গমের মূল্য প্রতি কেজি ২ টাকা।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : অক্ষম, অশক্ত, অসহায় বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল এবং ৬০ বছরের ওপরে সহায়সম্বলহীন সকলকে এই যোজনার আওতায় আনতে হবে। লোধা-শবর, টোটো ও বিরহোর জনজাতির সব পরিবারকে এই যোজনার আওতায় আনতে হবে।

প্রকল্পের নাম : সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস)

কাদের জন্য : ৬ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত সব শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য।

কী পাওয়া যাবে : জ্বালানির খরচ ছাড়া মাথাপিছু দৈনিক ২ টাকা - চাল, ডাল, সবজি, ডিম ইত্যাদি খাদ্যের জন্য

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ : শিশুরা ৮-১০ গ্রাম প্রোটিনযুক্ত ৩০০ ক্যালোরি খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাবার বছরে অন্তত ৩০০ দিন পাবে। অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা এবং বয়ঃসন্ধির কিশোরীরা শিশুদের দ্বিগুণ খাবার পাবে। প্রত্যেক জনপদে এবং তফশিলি জাতি ও আদিবাসী এলাকায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকবে। ঠিকাদারদের মাধ্যমে কোনোভাবেই খাবার সরবরাহ করা যাবে না। ■■

১০০ দিনের কাজে উদ্যানপালন প্রকল্প গড়ে তোলার নির্দেশিকা

আপনারা অবগত আছেন যে, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মসূচিতে ফল ও ফুলের চাষ বাড়ানোর জন্য উদ্যান পালনের প্রকল্প গ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্যানপালনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি জেলায় জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির (এনআরইজিএস) সাহায্যে ব্যাপক আকারে উদ্যানপালনের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার। এই প্রকল্পে কীভাবে করা যেতে পারে তা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

১) এই কাজের জন্য প্রথমেই দরকার প্রতি জেলার জেলা পরিষদের উদ্যোগে একটি করে প্রোজিনি অর্চার্ড (উদ্যান) গড়ে তোলা, যাতে উন্নতমানের ফলের চারা এই উদ্যান থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এই উদ্যান গড়ে তুলতে যে প্রযুক্তিগত সাহায্য লাগবে তা ওয়েস্টবেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBCADC) থেকে নেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর — যে দুটি জেলায় ওয়েস্টবেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের কোনো প্রজেক্ট অফিস নেই তারা ওই জেলার কাছাকাছি কর্পোরেশনের কোনো প্রজেক্ট অফিস বা ওই জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কারিগরি সহায়তায় এই প্রোজিনি অর্চার্ড গড়ে তুলবেন। এই প্রোজিনি অর্চার্ডের এলাকা অন্তত ১০ একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি এই প্রোজিনি অর্চার্ডের জন্য সরকারি জমি না পাওয়া যায় তাহলে জেলা পরিষদ তাদের নিঃশর্ত তহবিল, বিআরজিঅফ বা নিজস্ব সম্পদ থেকে এই জমি কেনার ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রোজিনি অর্চার্ড এনআরইজিএস-এর মাধ্যমে করা যাবে ও তার জন্য উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এক বছরের মধ্যে সমগ্র উদ্যানটি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। সেইজন্য ওই উদ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন বছরে এনআরইজিএসের প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করা যাবে। ওয়েস্টবেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন বা জেলার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এই কাজের রূপায়ণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারবে।

২) এরপরের দফায় কাজ হবে প্রত্যেকটি ব্লকে সম্ভব হলে একটি করে নার্সারি তৈরি করা, যেখান থেকে উন্নতমানের ফলের চারা জেলা প্রোজিনি অর্চার্ড-এর সহায়তায় সরবরাহ করা যাবে। এই নার্সারিগুলির এলাকা অন্তত এক একর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নার্সারিগুলিও একাধিক বছর ধরে এনআরইজিএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে তোলা যাবে। এই নার্সারিগুলি চালাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের স্থানীয় সংঘ যদি তারা এই কাজের জন্য উপযুক্ত হয় বা কোনো স্বনির্ভর দল যারা ইতিমধ্যেই ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে নার্সারি গড়ে তুলেছেন। এটা বলা অপেক্ষা থাকে না যে ওই নার্সারীগুলিতে সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেখানের যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্তোষজনক হতে হবে।

৩) তৃতীয় দফার কাজ হবে জমি চিহ্নিত করে উদ্যান পালনের নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ এবং সেই কাজ এনআরইজিএসের সাহায্যে বিভিন্নভাবে রূপায়ণ করা।

প্রথমত সেই সমস্ত পরিবার যারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন বা তফশিলি জাতি বা তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বা ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা বা ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা, তারা যদি তাদের জমিতে উদ্যানপালন করার জন্য রাজি থাকেন তাহলে সেই জমিতে ফলের গাছ লাগানোর নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে ফুলের চাষও করা যাবে, কিন্তু যেহেতু এনআরইজিএসে স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার কথা, মরশুমি ফুল চাষ করা ও একই জমিতে বারবার এনআরইজিএসের সাহায্যে প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব হবে না। ফলের বাগানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। প্রকল্প তৈরি করার সময় ওই পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে কী ধরনের গাছ লাগানো যায় তা স্থির করতে হবে এবং পরিবারের তরফ থেকে অন্তত একজন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ওই পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হন তাহলে সেই গোষ্ঠী, প্রকল্পটি রূপায়ণ করতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা রূপায়ণের দায়িত্ব নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত পঞ্চায়েত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের যে জমি আছে সেগুলিতে অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য খালি জমিতে ফলের গাছ লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারি জমি যা পতিত হিসেবে পড়ে আছে সেখানের ভূমি সংস্কার দফতরের অনুমতি সাপেক্ষে ফলের গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যাবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত স্কুল, যাদের গাছ লাগানোর মতো জমি আছে, তাদের একটি ফল ও সবজির বাগান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এই ক্ষেত্রে স্কুলকে অঙ্গীকার করতে হবে যে তারা ওই বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কী জাতের ফলের গাছ লাগানো হবে, তা ওই প্রতিষ্ঠান এবং এলাকার মাটির চরিত্র ইত্যাদি বিচার করে ঠিক করতে হবে।

তৃতীয় রকম কাজ হবে যে সমস্ত ফলের চারা বাড়ির উঠোনে বা বাড়ির সংলগ্ন জমিতে লাগানো সম্ভব সেইরকম চারা ব্যাপক সংখ্যায় তৈরি করে তা দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিতরণ করা ও তাদের এই চারা যত্ন করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এইসব পরিবারের মধ্যে যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় এসেছেন তাদের এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ তাদের মাধ্যমে চারা সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ হবে। যেসব গাছ কম জায়গায় বড় হতে পারে, যথা পেঁপে, কলা, সুপারি, নারকেল ইত্যাদি এবং সাধারণত যেসব গাছের চারা বাড়ির সংলগ্ন জমিতে লাগানো হয় যেমন আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, আতা, বেল, লেবু, সফেদা, আনারস ইত্যাদির চারা প্রয়োজনমতো তৈরি করে দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, আতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফলের বীজ থেকে চারা তৈরি করা সম্ভব। জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা কর্মসূচিতে এইগুলি তৈরি করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের উপযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী থাকলে, তাদের দেওয়া যেতে পারে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি জেলা পরিষদ জেলার এনআরইজিএস-এর বার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্যানপালনের জন্য যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে পরামর্শ ও সহায়তা দেবেন। যদি বার্ষিক পরিকল্পনার ইতিমধ্যেই অনুমোদন হয়ে থাকে তাহলে উদ্যানপালনের জন্য যে প্রকল্পগুলি নেওয়ার দরকার, তার জন্য একটি অতিরিক্ত পরিকল্পনার অনুমোদন দেবেন। এই পরিকল্পনা ঠিকমত রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব হবে জেলার এনআরইজিএস সেলের। তার জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBCADC), জেলা হর্টিকালচার অফিসার ও কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে এই প্রকল্পগুলিকে বিআরজিএফ-এর জাতীয় হর্টিকালচার মিশন বা অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বিত করা যেতে পারে।

(মানবেন্দ্রনাথ রায়)
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নং: ৩১৪৮/১ (৩৬)-পি অ্যান্ড আর ডি/পি/এন/এন আর জি এ/১৮এস-১৪/০৬ তারিখ : ১৫.৫.২০০৯

সম্পাদকীয় সংযোজন : এটি একটি সরকারি নির্দেশিকার হুবহু বয়ান। কেবল পত্রিকার মতো করে বানানের বদল করা হয়েছে।

■■

চাষের কথার
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক ৩০ টাকা

রেগার কাজ এখন ছোট চাষির জমিতে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এক নির্দেশে (নং 900-RD/NREGA/185-01/07 তারিখ: ০৯.০২.২০১০ পাশে ওই নির্দেশের কপি দেওয়া হল) সব জেলা শাসক ও জেলা প্রোগ্রাম অফিসারদের বলেছেন — এখন থেকে সরকারি হিসেবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমিতে তাদের উন্নয়নের জন্য এনআরইজিএ বা ১০০ দিনের কাজ করা যাবে। এ সম্পর্কে মূলত আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জমিতে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মধ্যে যেসব কাজ করা যাবে সেগুলি হল সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির উন্নয়ন ও উদ্যানপালন বা হর্টিকালচারের কাজ। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর আশা করছে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের থেকে এ বিষয়ে প্রচুর আবেদন করা হবে। সেই কারণে জেলা দফতরগুলিকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতিমূলক কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

আমাদের মনে হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা এই কাজটি একটু পরিকল্পনামাফিক করতে পারলে, একদিকে তাদের পরিবারের কাজের দিন বাড়বে, একইসঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হবে, কৃষি থেকে চাষির ধারাবাহিকভাবে আয় বাড়বে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই একইরকম কাজ গত ১৫ বছর ধরে করে চলেছি। একই সঙ্গে আমাদের কাজগুলি সত্যিই ভালো হল কিনা তা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। কাজগুলি প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্নরকম প্রচার এবং প্রযুক্তিগত সামগ্রী তৈরি করেছি। রাজ্য কৃষি কমিশন আমাদের বিভিন্ন কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। সম্প্রতি রাজ্য কৃষি দফতরের পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় এই ধরনের নানারকম কাজ আমরা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে করছি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
63, N. S. ROAD : JESSOP BUILDING : KOLKATA - 700001

ORDER

No. 900 -RD/NREGA/185-01/07 Dated : 09.02.2010

With the Small and Marginal Farmers now being eligible for individual benefit under NREGS on their own land the scope for employment generation on this sector has increased manifold. The activities that are allowed under this sector are - irrigation facilities, land development and horticulture plantation. Demand for such benefits from the eligible households expected to be quite high and districts are likely to be required to take up sizable number of units of work under this sector. Timely preparation of estimates of such works and executing the same without delay is of key importance. The general procedure of preparation of individual estimates, get those estimates vetted by the competent authorities and then taking up the work in the field is, perhaps, not a workable proposition so far as implementation of such large number of individual benefiting units of work are concerned. It will be rather advisable to have model estimates of each of the activities in the districts. The district NREGA cell should prepare such model estimates with due regard to the districts specific requirements and have it vetted by the competent authorities. The works may be executed on the basis of such model estimates. Separate vetting for each and every individual estimate will not be required in such cases.

This will take immediate effect.

Sd/-
Principal Secretary to the
Government of West Bengal

No.900/1(19)-RD/NREGA/185-01/08 Dated : 09.02.2010

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The District Magistrate & District Programme Coordinator _____
2. The Additional Executive Officer, Siliguri Mahakuma Parishad.

সম্পাদকীয় সংযোজন: পাঠকের সুবিধের জন্য নির্দেশিকার ইংরেজি রূপ ও আমাদের তৈরি বাংলা বয়ান পাশাপাশি দিয়ে দেওয়া হল।

এবিষয়ে উৎসাহী চাষিরা আমাদের সঙ্গে যোগযোগ করতে পারেন

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার
৫৮ এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৪২
ফোন : ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, ৯৪৩৩৩৯০৮২৯, ৯৭৩২৬৯১৯৮২

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ

সহায়

প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যে, বেশ কয়েকবছর ধরে আমরা ডি আর সি এস সি-র পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় (পাহাড়ি, শুখা ও উপকূল এলাকা) পেছিয়ে পড়া গরিব মানুষকে নিয়ে কাজ করছি। গত ৫-৬ বছর আমরা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, কৃষি প্রভৃতি সরকারি দফতর ও জেলা গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সঙ্গেও বিভিন্ন কাজের সূত্রে যুক্ত। এরই অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পেছিয়ে পড়া জেলায় (বীরভূম, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) আদিবাসী ও তফশিলি জাতির অর্ন্তভুক্ত যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেই সংক্রান্ত ব্যবসা বা উদ্যোগ নিতে সাহায্য করা হবে। তবে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই সহযোগিতার কাজ চলবে আগামি পাঁচ বছর।

প্রশিক্ষণের বিষয়:

সুস্থায়ী কৃষি
জৈব সার ও কীটনাশক তৈরি
নার্সারি ও নার্সারির বাজার তৈরি
সবজি উৎপাদন ও ব্যবসা
মাশরুম চাষ
ক্ষুদ্র প্রাণীপালন (দেশি মুরগি-শূকর-খরগোশ)
দেশীয় মাছ চাষ ও মাছের খাদ্য তৈরি
শালপাতার থালা-বাটি তৈরি
বাবুই ঘাসের সামগ্রী তৈরি
তালের রস ও রসজাত দ্রব্য তৈরি
নিম বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজার তৈরি
ক্ষুদ্র সেচ কারিগরি
মাটি-জমি সংরক্ষণ ও তদারকি
পুকুর ব্যবস্থাপনা
বায়োগ্যাস তৈরি
জৈব গুল তৈরি

শর্তাবলি:

১. প্রশিক্ষণ-প্রার্থীকে বীরভূম, বাঁকুড়া বা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা হতে হবে।
২. প্রার্থী তফশিলি উপজাতি - তফশিলি জাতি (যুবক-যুবতী বা কিশোর-কিশোরী) সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন।
৩. বয়স হবে ১৫-৩০ বছরের মধ্যে ।
৪. প্রার্থীকে সাধারণ পড়তে-লিখতে ও হিসাব করতে জানতে হবে।
৫. যে বিষয়ে প্রশিক্ষণের আবেদন করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে প্রার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হবে।

প্রার্থীদের যাতায়াত খরচ ছাড়া প্রশিক্ষণের বাকি খরচ ডি আর সি এস সি বহন করবে

সম্পাদকীয়

নতুন রূপে চাষের কথা

চাষের কথার আকারপ্রকারে আমরা বেশ কিছু অদলবদল করছি। এই বদল আপনার ভালো লাগবে মনে হয়। বিষয়, আদল ও প্রকাশ-ব্যবধান তিন ক্ষেত্রেই, কৃষিপত্রকে সাজানো হচ্ছে নতুন করে। বিশেষ করে প্রকাশ-ব্যবধানে একটু বড়সড় বদলই হচ্ছে। আগে আপনার কাছে আমরা সময় অন্তরে পৌঁছে দিতাম দুটি চাষের কথা, একটি মাসিক ও একটি ত্রৈমাসিক। সেই রেওয়াজ একটু পাল্টে যাচ্ছে এবারে। এখন থেকে চাষের কথা কেবল দুমাস অন্তরই বেরোবে, ত্রৈমাসিকটি থাকছে না। এমন করতে হচ্ছে কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে। আগে এই কৃষিপত্রের জন্য উপযুক্ত অঙ্কের অনুদান মিলত। এখন তার পরিমাণ কমছে। আগে তাই সুস্থায়ী কৃষির প্রসারের স্বার্থে পত্রিকা প্রকাশ থেকে ডাকমাশুল সর্বত্র ভরতুকি দেওয়া যেত। এখন যা আমরা ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠব না। তবে পত্রিকার গুণগত মান নিয়ে কোনো সংশয় রাখছি না। বরং তা কী করে আরো ভালো হয়, তাই নিয়েই আমরা এখন ব্যস্ত থাকছি। বলে রাখা ভালো, যে গ্রাহক চাঁদার আপাতত কোনো বদল হচ্ছে না। চাঁদা যা ছিল তাই থাকছে। আর একটি কথা, মাস-বছর বদলালেও পত্রিকা যে অব্দি বেরিয়েছিল সেই সংখ্যা ধরে বর্ষ ও সংখ্যার ধারাবাহিকতা একই রাখা হচ্ছে। ফলে গ্রাহক বন্ধুর গ্রাহক মূল্য অনুযায়ী সংখ্যা হিসেব করে পত্রিকা পেতে অসুবিধা হবে না।

এই বদল যখন হচ্ছে, তখন কৃষিতেও নানা রূপান্তরের কথা শুনতে পাচ্ছি। এই রূপান্তরের অনেকটাই বীজ নিয়ে। তার একদিকে বিটি বীজের বাড়বাড়ন্ত, অন্যদিকে মন্ত্রীসভায় বীজ বিলের অনুমোদন। যদিও বিটি বেগুন আপাতত নাকচ হয়েছে, কিন্তু আগামীতে তা ফিরেও আসতে পারে। আর গত তিনবারের মতো না হয়ে যদি বীজ বিলে সংসদ সায় দেয়, তবে বিটি বীজ এড়িয়ে যাওয়ার আর কোনো মানে থাকবে না। কারণ এই বিলে বলা আছে, কৃষক কোনো বীজ রাখতে পারবেনা। তখন দোকান যে বীজ দেবে তাই মাঠে বুনতে বাধ্য আমি। বীজের ওপর যদি বাইরের এমন নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়, তবে তা দেশের কৃষি-অর্থনীতিকে পরাধীন করবে না তো।

শুভেচ্ছা সহ
সম্পাদক
এপ্রিল ২০১০

সর্বনাশের চুক্তি চাষ

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমরা আলোচনাটি এভাবে সাজাতে পারি — চুক্তি চাষ কী? চুক্তি চাষের পটভূমি কী ছিল? ভারতবর্ষে এর প্রভাবই বা কী?

ভারতের চাষ পদ্ধতিতে একটা বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে সরকার। এই উদ্যোগ চলছে গত চার-পাঁচ বছর ধরে। এই সংবাদটি এল জাতীয় কৃষক-নীতির হাত ধরে। তার মানে এই নয় যে চুক্তি চাষ আগে ছিল না। ছিল। তবে সরকারিভাবে নয়।

এখন প্রশ্ন এই কৃষক-নীতি বিষয়টি কী? এটি কেন্দ্রীয় সরকারি জাতীয় নীতি। কাদের জন্য? চাষিদের জন্য। এই নীতিতে এতদিনকার সাবেকি বা প্রচলিত ভাবনার বদল ঘটাল সরকার। কী সেই বদল? বদল সবুজ বিপ্লবের ধারণার। কেন বদল? কারণ এই ধারণা চাষিদের আর লাভের মুখ দেখাচ্ছে না। তাহলে কোথায় ব্যর্থতা? ব্যর্থতা সবুজ বিপ্লবের পলিসি বা নীতিতে। আমরা জানি এই বিপ্লব ঘটানো হয়েছিল বীজ-সার-জল ও যন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ কিনা শ্রমের বদলে এল যন্ত্র। যন্ত্রনির্ভর চাষ-ব্যবস্থা। কেন? না খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। চাহিদার সঙ্গে জোগানের সমতা থাকতে হবে। খাদ্যের গুণমান ভালো হতে হবে। তবে হ্যাঁ, প্রথমদিকে ফল পাওয়া গেল সবুজ বিপ্লবের। তবে বেশিদিন চলল না। প্রথমদিকে উৎপাদন বাড়লেও কমতে থাকল ধীরে ধীরে। উৎপাদন কমছে আর চাষের খরচ বাড়ছে। বাড়ছে জলের-সারের ব্যবহার। খরচ বাড়ছে তাই আয় কমছে। আয় কমছে তাই কৃষক জমি ছাড়ছে। ছোট কৃষকের থেকে জমি চলে যাচ্ছে বড় কৃষকের হাতে। তার মানে ভূমিসংস্কারের ধারণা থেকে সরে যাওয়া। ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশেরও। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে সরকার নিয়ে এল নতুন ধরনের চাষ পদ্ধতি। এর নাম দেওয়া হল চিরসবুজ বিপ্লব। অর্থাৎ কিনা সবুজ বিপ্লব থেকে চিরসবুজ বিপ্লব। যার মধ্যেই প্রকাশ পেল চুক্তি চাষ। এবার প্রশ্ন কী চুক্তি? কাদের সঙ্গে চুক্তি? এবং এই চুক্তির শর্ত কী? চুক্তি হবে চাষির সঙ্গে অনেকের।

অর্থাৎ কিনা যারা কিনবে। তার মানে দাঁড়াল চুক্তি হতে পারে ব্যবসায়ী, মজুতদার, খুচরো ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে। চাষির সঙ্গে যিনি চুক্তি করবেন তিনিই বলে দেবেন, চাষি কী শস্য ফলাবে, কীভাবে বানাবে, কী ব্যবহার করে বানাবে, কত পরিমাণ ফলাবে। গুণগত মান কী হবে। কবে কিনবেন এবং কত দামে কিনবেন। এতে চাষির লাভ কী? আপাতপক্ষে দেখলে চাষির কিছু লাভ আছে। অন্তত এই নীতিতে সরকার সেটা বলার চেষ্টা করছে।

চাষি এত দিন চুক্তিতে ছিল না। তার অর্থ চাষি ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় ছিল। সে নিজের মতো করে, নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফসল ফলাত। সেখানে তাকেই বাজারে যেতে হত ফসল বিক্রি করতে। বাজারে দামের ওঠাপড়া আছে। ফলে চাষির লাভের ও নিশ্চয়তায় প্রশ্নচিহ্ন থাকছে। আবার বাজারে চাহিদা না

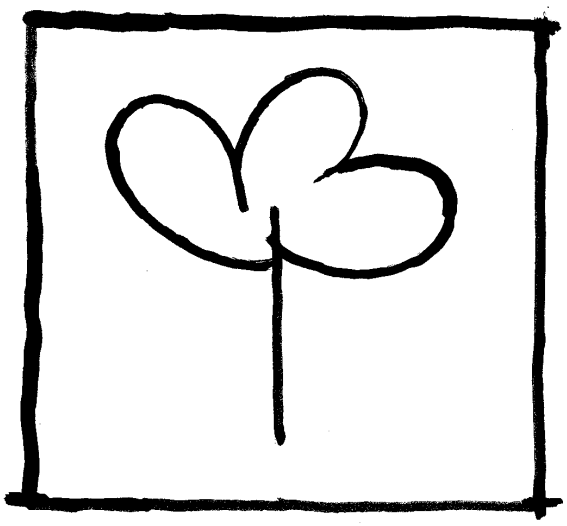

থাকলে বিক্রির অনিশ্চয়তা। বিষয়টা সহজ করে বললে দাঁড়ায় চাষি ফসল ফলাত ঠিকই, কিন্তু তাতে ঝুঁকি থাকত অন্তত ৯৯ শতাংশ। চুক্তি চাষে যেটা নেই। এদিক থেকে দেখলে চুক্তি চাষ চাষিদের ভরসা জোগায়। তাহলে চুক্তি চাষে আপত্তি কীসের? ভয়ের জায়গাগুলি কী কী? প্রথমত দেখতে হবে, একটা অঞ্চলে একজন চাষি কীভাবে শস্য নির্বাচন করে। সেখানে দেখা যাবে পরম্পরাগতভাবে বা ঐতিহ্যগতভাবে শস্য নির্বাচন করছে। কেন করে? কারণ সেটা অঞ্চলের মাটির সঙ্গে, আবহাওয়ার সঙ্গে, চাহিদার সঙ্গে মিলে যায়। এছাড়াও আছে চাষির নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিন ধরে চাষি সেই ফসল সেই আবহাওয়া ও সেই মাটির সঙ্গে পরিচিত। ফলে সেই ফসল চাষ কেমন হবে, কখন হবে, কী করতে হবে এসব তার জানা। অর্থাৎ ভেতরের চাহিদা তাকে বলে দেয় কী ফসল সে চাষ করবে। আর একটা বড় নির্বাচন—আমার চাহিদা, অর্থাৎ চাষির নিজের চাহিদা। আমি রুটি খাই তাই আমি গম চাষ করি। আমি ভাত খাই, তাই করি ধান চাষ। এলাকায় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা আছে সে কারণে পাট চাষ। মূলকথা চাষির শস্য নির্বাচনটা ঐতিহাসিকভাবে হয়ে যায়।

ভেতরের চাহিদাকে সরিয়ে রাখলে আসে বাহিরের চাহিদা। সেটা কী? বিষয়টি হল অঞ্চলের বাইরে দেশের চাহিদা, দেশের বাইরে বিদেশের চাহিদা। ভিতর সরিয়ে বাহিরকে গুরুত্ব। অঞ্চলের কৃষকের নির্বাচিত চাহিদা সরিয়ে বাইরের চাহিদা পূরণ। এই বাইরের চাহিদা থেকেই চুক্তি চাষ। সেখানে ভেতরের অর্থাৎ আমার বা চাষির নয়। অঞ্চলের নয়।

তাই মার খায় অঞ্চলের চাহিদা। চাষির অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই বলি, যেটা চাষ করে সে সেটার বীজ বোনে। চাষ পদ্ধতি জানে। অর্থাৎ কিনা সে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা পরম্পরাগত জ্ঞান দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করে। সে জানে ওই ফসলের চরিত্র কেমন। জানে কখন নিড়ানি দিতে হবে। কখন জল দিতে হবে, সার দিতে হবে ইত্যাদি।

অথচ চুক্তি চাষের পদ্ধতি তার হাতে নেই। পরিচিতি নেই সেই পদ্ধতির সঙ্গেও। তাই সমস্যা হলে সমাধানও নেই তার হাতে। ফলে ফসল কম হবে। ফসল কম হলে চুক্তি অনুযায়ী সাপ্লাই নেই। সাপ্লাই কম মানে চুক্তিভঙ্গ। আর চুক্তিভঙ্গ মানেই টাকা কম। আর যদি একেবারেই ফলন না হয়, তাহলে সেই চাষি জড়িয়ে পড়ল দেনার জালে। এরপর চাষি বাধ্য হবে তার জমি বিক্রি করতে। ঘুরে ফিরে দাঁড়াল ছোট চাষি পরিণত হল জমিহীন দিনমজুর শ্রমিকে।

চুক্তি চাষে উপকরণ কোথা থেকে আসে? আসে বাইরে থেকে। কেন বাইরে থেকে? কারণ অনেকগুলি। ধরুন কোনো কোম্পানি বিশেষ ধরণের টম্যাটো কিনতে চায় সসের জন্য। তার জন্য ভালো বীজ ও উপকরণ চাই। এখানে ওই কোম্পানির ইচ্ছে অনুযায়ী যেমন ফসল নির্বাচন হচ্ছে তেমনি সাপ্লাই হচ্ছে উপকরণের। কারণ আমার চাহিদা কী আমি জানব। চাষি নয়। অন্যদিকে যে বীজ ওরা দিচ্ছে তার চরিত্র চাষি জানে না। যেসব বীজ দেয় সেগুলি বেশিরভাগই জিএম ক্রপ। এই ধরনের বীজ আপাতভাবে

অন্ন চিন্তা

মাটির ক্ষতি না করলেও, দীর্ঘমেয়াদে করে। ফলে দেখা যাবে ওইসব কোম্পানি হয়তো তিনবছর বা চারবছর চাষ করার পর চলে গেলে, পাঁচ বছরের মাথায় গিয়ে চাষি চাইলেও অন্য চাষ করতে পারবে না। আবার ওই বিশেষ ধরনের শস্য যে কেবল সেই মাঠেরই ক্ষতি করল এমন নয়। তার পাশাপাশি মাঠেরও ক্ষতি হয়ে গেল। হয়তো সেখানে স্থানীয় চাহিদা মেনেই চাষ হচ্ছে কিন্তু এই মাঠে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে পাশের মাঠের বন্ধুপোকা মারা পড়ল। অর্থাৎ আমার স্থানীয় চাহিদা নষ্ট হল।

চুক্তি চাষে কেবল যে মাটির ক্ষতি তা নয়। অন্য ক্ষতিও হয় – ধরা যাক কোনো একটা শস্যের পৃথিবীর বাজারে চাহিদা আছে। ফলে সেই ফসলের চাষ হল। দেখা গেল কোনো একটা কারণে সেই চাহিদাটা কমে গেল। কারণ আমার চাহিদা বদলাতে পারে। চাহিদা কমলে যে বহুজাতিক সংস্থা চাষির সঙ্গে চুক্তি করেছিল তারা চুক্তি চাষ থেকে সরে এল। ফলে মার খেল চাষি। আবার হঠাৎ করে কোনো নির্দিষ্ট ফসলের দাম কমে গেল। বাজারে যদি মুনাফা না হয় বিক্রেতা অন্য শস্যে যাবে। কারণ দাম নেই মানেই মুনাফা নেই। আর মুনাফা নেই মানেই ব্যবসায়ী সেই শস্য কিনবে না। চাষির তখন কী হবে। সে তো তার মাঠ ওই ফসলের জন্য তৈরি করেছে। সেখানে অন্য ফসল হবে না। কারণ ফসল এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে ধান করা যাবে না। তাই বিষয়টি এত সোজা নয়।

এই ধরনের চাষ পদ্ধতিতে যেহেতু জমির উর্বরতা কমে যায়, জল কমে যায়, ফলে চরিত্র বদলে গেল। ফলে পরবর্তী চাষে অসুবিধা হবে। বাজার আছে বলে চুক্তি হচ্ছে। বাজার থাকবে না, ব্যবসায়ীও আর চুক্তি করবে না। অথচ মূল-খাদ্যের বাজার অনিশ্চিত নয়। ধানের বাজার, গমের বাজার অনিশ্চিত নয়, শাকের বাজার অনিশ্চিত নয়। কিন্তু যে ফসল কারখানায় গিয়ে কৃষিজাত পণ্য তৈরি হচ্ছে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেউ বলতে পারবে না যে আগামী ১২ বছর এই কৃষিজ পণ্যের বাজার থাকবে। অর্থাৎ এখানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিষয়টি চলে আসছে। মানুষের চাহিদা বদলাতে পারে। স্বাদ বদলাতে পারে। বিকল্প আসতে পারে। অথচ খাদ্যাভ্যাস বদলানো এত সোজা নয়। ভাত থেকে সহজে রুটিতে আসা যায় না বা রুটি থেকে ভাতে আসা যায়না। ডাল থেকে, জোয়ার থেকে সরে আসতে পারব না। অর্থাৎ কৃষক আগে যেটা করত সেটায় তার নিশ্চয়তা ছিল। এখন যেটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা বরং অনিশ্চিত। যা চাষিদের কাছে একটা বড় সমস্যা। আর একটা বিষয় হল চুক্তি চাষের খরচ। দামি ফসল চাষ করলে (যেমন ফুল, ফল বা অন্য কিছু) খরচ বাড়ে অনেক। চাষির পক্ষে সেই খরচ বহন করা দুঃসাধ্য। ফলে সে ঋণ করে। ঋণ নেওয়ার পর কোনো কারণে ফসল ভালো না হলে (যেহেতু অনিশ্চিত ফসল) দাম পেল না। দাম না পাওয়া মানে ঋণ শোধ না করতে পারা। আবার ব্যবসায়ী চুক্তিমতো ফসল নাও কিনতে পারে। সে যে কিনবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাধ্যবাধকতা নেই। যেহেতু তারা ক্ষমতাশীল ব্যবসায়ী, সারা বিশ্বজুড়ে তাদের বাজার। এক জায়গা থেকে সরে গেলে তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু চাষির তো ওইটুকু জায়গা। ফলে কথার খেলাপ করলে সে মারা গেল। অর্থাৎ চুক্তি চাষ ধীরে ধীরে ছোট ও মাঝারি চাষিকে সরিয়ে ফেলার অভিসন্ধি। কারণ ঋণশোধ করতে গিয়ে সে জমি বেচবে। এটা চাষিকে উচ্ছেদ করার এক ধরনের চক্রান্ত।

যদি বলি এর জন্য তো কোম্পানিগুলিকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। তখন প্রশ্ন আসবে কার কাছে জবাবদিহি করবে? পঞ্চায়েত কী করবে? তার হাতে কী সেই ক্ষমতা আছে। ফলে একটা অসম সম্পর্ক দানা বাঁধে। কারণ তারা তো পঞ্চায়েতের হাতের মুঠোয় নেই। ফলে সত্যি সত্যি কোনো সুরাহা হয় না।

...চুক্তি চাষের প্রস্তাবনায় একটা কথা বলা আছে। বলা আছে দু-পক্ষের চুক্তি মান্য হচ্ছে কিনা তা দেখবে পঞ্চায়েত। বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভাবলে বুঝব একটা বড় কোম্পানি যদি চুক্তিভঙ্গ করে, তাহলে পঞ্চায়েত কী করবে?

বড় চাষিদের নিয়ে আবার অন্য সমস্যা। তারা হয়তো ভাবল যে আর খাদ্যশস্য তৈরি করবে না। তারা বাণিজ্যমুখী শস্য চাষ করবে। তখন দেখা দেবে খাদ্যশস্যে টান। বড় চাষির টাকা আছে। সে খাবার কিনতে পারবে। অন্যরা পারবে না। কারণ তাদের টাকা নেই। এর ফলে যে কেবল ওই অঞ্চলেরই খাদ্যে নিরাপত্তা থাকল না তা নয়। বরং সারা ভারতবর্ষব্যাপী খাদ্যের হাহাকার তৈরি হল। যদিও আমাদের ভারতবর্ষে চুক্তি চাষ সেই পর্যায়ে যায়নি। তবে নীলচাষের গল্পতো আমরা সবাই জানি। সেটাও একধরনের চুক্তি। তবে বলা হচ্ছে তারা বিদেশি শাসক বলে এ দেশের স্বার্থ দেখেনি। এখন স্থানীয় সরকার আছে তারা স্বার্থ দেখবে। বাঁচাবে। কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এক একটি শস্যকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন মালয়েশিয়ায় রবার চাষ।

এর ফলে যেটা অসুবিধে হয় তা হল, ফসল-বৈচিত্র হারায়। ফসল বৈচিত্র মানে কী? মানে একই জায়গায় নানা ধরনের ফসলের চাষ। এর সুবিধে হল কোনো এক সময়ে কোনো এক ঘটনার ফলে কোনো এক ফসল নষ্ট হলেও চাষি অন্য ফসল পেতে পারে। এতে করে একেবারে দুর্ভোগে পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। চুক্তি চাষের ফলে শস্য বৈচিত্র নষ্ট হবে। শস্য বৈচিত্র হারিয়ে যাওয়া মানে, অনেক মানুষের না খেতে পাওয়া। অনেক জৈববৈচিত্র হারিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ প্রাণীর ক্ষতি করা। প্রাণীর ক্ষতি হওয়া মানে মানুষের খাদ্যে হাত পড়া। অর্থাৎ দুধ-ডিম মাংস না পাওয়া। চুক্তি চাষে যদি ফসল না ফলে তাহলে ব্যবসায়ী কিছু পেল না। আবার ব্যবসায়ীর না পাওয়া মানে কৃষকের না খাওয়া।

কারণ ব্যবসায়ী ফসল পেলে তবে কিনবে। তবেই চাষি টাকা পাবে। তার ফলে চাষির ঘরে রান্না হবে। তাই শস্য বৈচিত্র খুব জরুরি। শস্য বৈচিত্রের অন্য একটা দিক আছে—ভারতবর্ষে অনাহারের সংখ্যা বাড়ছে। যেমন দুবেলা খেতে পায়না এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সপ্তাহে ৪ দিন দুবেলা খায় এমনও আছে। আবার সপ্তাহে প্রতিদিনই একবেলা খায় এমন সংখ্যাও কম নয়। না খাওয়া, কম খাওয়া, একবেলা খাওয়া,এগুলিই বড় সমস্যা। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য করা। মানুষ প্রকৃতি থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করত বেশি। যেমন নদীর ধারের মানুষ, তারা মাছটা পেয়ে যেত নদী থেকে। এইরকম জঙ্গলের মানুষ, পাহাড়ের মানুষ তাদের খাদ্যাভ্যাস সেইভাবেই তৈরি হয়। যে মুহূর্তে একচেটিয়া চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন এসব হারাবে। অর্থাৎ মানুষের বাজারে না গিয়ে যে খাবার পাওয়া তা আর হবেনা। যেমন ধানের বিভিন্ন উপজাত... অর্থাৎ বৈচিত্র—এ যে কেবল খাদ্য বৈচিত্র ধরে রাখে তা নয়। কর্মসংস্থানের সুযোগও হয়। ধান চাষে যেমন লোক লাগে, তেমনি ধানকে ঘিরে কাজের সম্ভাবনাও বাড়ে। খাদ্যের বৈচিত্র কম তো কর্মসংস্থানও কম।

অনেক ফসল আছে যেগুলি সোজাসুজি মাঠ থেকে কারখানায় যায়। যেমন টম্যাটো, ফুল ইত্যাদি। এসব তো চুক্তি চাষের ফলে সরাসরি লরিতে করে কারখানায় যাচ্ছে। ফলে এর মাঝে যারা কাজ করত তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে। কর্মসংস্থান না হওয়া একটি বড় সমস্যা। চুক্তি চাষের ফলে পরিবেশও রেহাই পাবে না। শস্যপর্যায়—অন্তর্বর্তী ফসল চাষ এসব তো চুক্তি চাষের বেলায় থাকছে না। ফলে খাদ্যশৃঙ্খল নষ্ট হবে।

১৯৯০-এর দশক থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা বড় পরিবর্তন এল। এল সরকারের সুবিধার্থে। যেসব জায়গায় সরকারের দায়িত্ব ছিল, সেগুলি চলে গেল বেসরকারিতে। ফলে বাজার আর সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়। এল বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার নয়। ঋণ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মজা হল চাষিকে ঋণ নিতে বাধ্য করা। অর্থাৎ তাকে এমনভাবে বেঁধে ফেলা হবে যে, তার আর কোনো পথ থাকবে না। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রাখতে না পারলেই ঋণ নিতে হবে। বিদেশি ব্যাঙ্ক যখন ঋণ দেয় তারা স্পষ্টভাবে বলে দেয়, সে দেশের অর্থব্যবস্থা কেমন হবে। সেখানে রাষ্ট্র এমন কোনো পণ্য তৈরি করবে না, যেটা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চলে আসবে। পুঁজিকে অবাধ করে দাও। রাষ্ট্র সরে এলে তার জায়গায় ঢুকে গেল পুঁজি। অবশেষে সেই পুঁজির বাজারই তৈরি হল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো পুঁজি অবাধ করলে দেখা যাবে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ। বলা হবে তুমি এটা পারবে না। এই বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ পুঁজি চাইবে কীভাবে সে বিনিয়োগ করবে। ■■

২৪ আগস্ট ২০০৯-এ শ্রীদাশগুপ্তের বাড়িতে চাষের কথার তরফে ক্যাসেট-ধৃত এক আলাপচারিতা থেকে এই নিবন্ধের নির্মাণ। অনুলিখন : **শ্রী সূর্যকান্ত দাস**

আগামী খরিফ মরশুমের চাষবাস

পশ্চিমবঙ্গের খরিফ মরশুম অর্থাৎ বর্ষাকালে উঁচু, নিচু, মাঝারি সব জমিতেই ধানচাষ হয়ে থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ এই সময় বীজতলা এবং মূল ধান জমি তৈরির কাজ করা হয়। আমরা যেসব এলাকায় চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত সেখানকার চাষিরা এই খরিফে যেসব কাজ করবেন তা এখানে দেওয়া হল। আপনিও এই কাজ করে দেখতে পারেন।

- হাল করে জমি চষে ফেলা।
- কম্পোস্ট বা গাদাসার জমিতে মেশানো।
- জমিতে পাঁকের ব্যবহার।
- ভিজে এলাকায় ধানের আগে ধনচে, এবং শুখা এলাকায় শন, গুয়ার ইত্যাদির চাষ এবং তা সবুজসার হিসেবে জমিতে ব্যবহার। এক্ষেত্রে এই গাছগুলি চার-পাঁচ ইঞ্চি বড় হলেই মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। এতে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে।
- অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাজোস্পিরিলাম, ফসফো-সল্যুবিলাইজিং ব্যাকটেরিয়া (বা পিএসবি যা জমিতে ফসফেটের পরিমাণ বাড়ায়) জাতীয় জীবাণুসার ব্যবহার।
- সবুজ পাতাসার হিসেবে গ্লিরিসিডিয়া, মিনজিরি, সুবাবুল পাতা মেশানো।
- জমিতে জলকে ধরে রাখার জন্য আল প্রস্তুত করা। সেক্ষেত্রে আলেও ধনচে গাছ লাগানো যেতে পারে বীজ উৎপাদন করার জন্য।
- অ্যাজোলা মাটিতে মেশানো।
- জমির গঠন পরিবর্তন করে একত্রে ধান, মাছ ও অ্যাজোলা চাষ। জমির মান উন্নয়ন ও ধানচাষে খরচ কমানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চাষি বহু বছর ধরে দেশি ধানের চাষ করেন। যাঁরা এখনো দেশি ধানের চাষ করেন তাঁদের আমরা সাধুবাদ জানাই, কারণ তাঁরা জীব-বৈচিত্র রক্ষার জন্য কাজ করছেন। আমরা যেসব জায়গায় কাজ করি সেইসব জায়গার চাষিরা এই মরশুমে যে দেশি ধান চাষ করবেন বলে ঠিক করেছেন তা হল-
- পুরুলিয়ার হুড়া, কাশিপুর ব্লকে: আসনলেওয়া, চন্দ্রকান্ত, রঘুশাল, ঝুলর, ভূতমুড়ি, কাঁকড়ি, মুরগিবাদাম, কলমকাঠি, দেরাদুন প্রভৃতি। এই ধানগুলির গড় ফলন বিঘা প্রতি (বা ৩৩ শতকে) ৮-১০ মন।
- বীরভূমে রঘুশাল, গোবিন্দভোগ, ডহরলাগরা, পারু, বাসমতী, লঘু ধানের চাষ হবে যেগুলির বিঘা প্রতি ফলন ১০ মন।
- উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার এলাকার চাষিরা যে দেশি ধানগুলি চাষ করবেন সেগুলি হল জলঢ্যাপা, দুধকলম, পাকড়ি, বিরই, যশোয়া, কালোনুনিয়া, কাটারিভোগ, বোচি, অগ্নিশাল। এই ধানগুলি স্থানীয় গোচি পদ্ধতিতে* চাষ করলে গড়ে বিঘাপ্রতি ১০ মন ফলন পাওয়া যায়।
- সুন্দরবনের আয়লা কবলিত অঞ্চলে যে সমস্ত দেশি ধানের চাষ করা হবে সেগুলি হল পাথরপ্রতিমা ব্লকে দুধেশ্বর, সবিতা পাটনাই, মরিচশাল, মালাবতী, ময়ূরপঙ্খী, গোবিন্দভোগ। এগুলির বিঘাপ্রতি ফলন ৮-৯ মন।
- সন্দেশখালি এলাকায় নিচুজমিতে চাষ হবে হোগল, মালাবতী, রামশাল, পাথরকুচি, গোপালভোগ, হনুমান জটা, পাটনাই, দাদশাল, হলদিকাঠা। এগুলির বিঘাপ্রতি ফলন ১০মন।
- কানিং এলাকায় চাষ হবে লাঠি পাটনাই, সবিতা পাটনাই, চামরমণি, গেঁতু, দুধেশ্বর, তালমুগুর, কালোমোটা ও মরিচশাল। এই ধানগুলির বিঘা প্রতি উৎপাদন ৮ বস্তা।
- বাসন্তী এলাকায় চাষ হবে মরিচশাল, দুধেশ্বর, জোতু, সবিতা পাটনাই। এগুলির বিঘা প্রতি ফলন ৮ বস্তা।
- হিঙ্গলগঞ্জে চাষ হবে নোনাশ্রী, দুধেশ্বর, গোবিন্দভোগ, বেগুন বিচি, দানশাল ইত্যাদি ধানের। এগুলি বিঘাপ্রতি ফলন (৭-৮) মন।
- দেগঙ্গা, বসিরহাট, স্বরূপনগর এলাকায় চাষ হবে হামাই, লালকামিনী, বোটা, জটিবালাম, লালজাবরা, সাদাজাবরা, কালোবোরো, গোবিন্দভোগ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ধানের। এগুলির বিঘাপ্রতি ফলন ৬-৮ বস্তা।

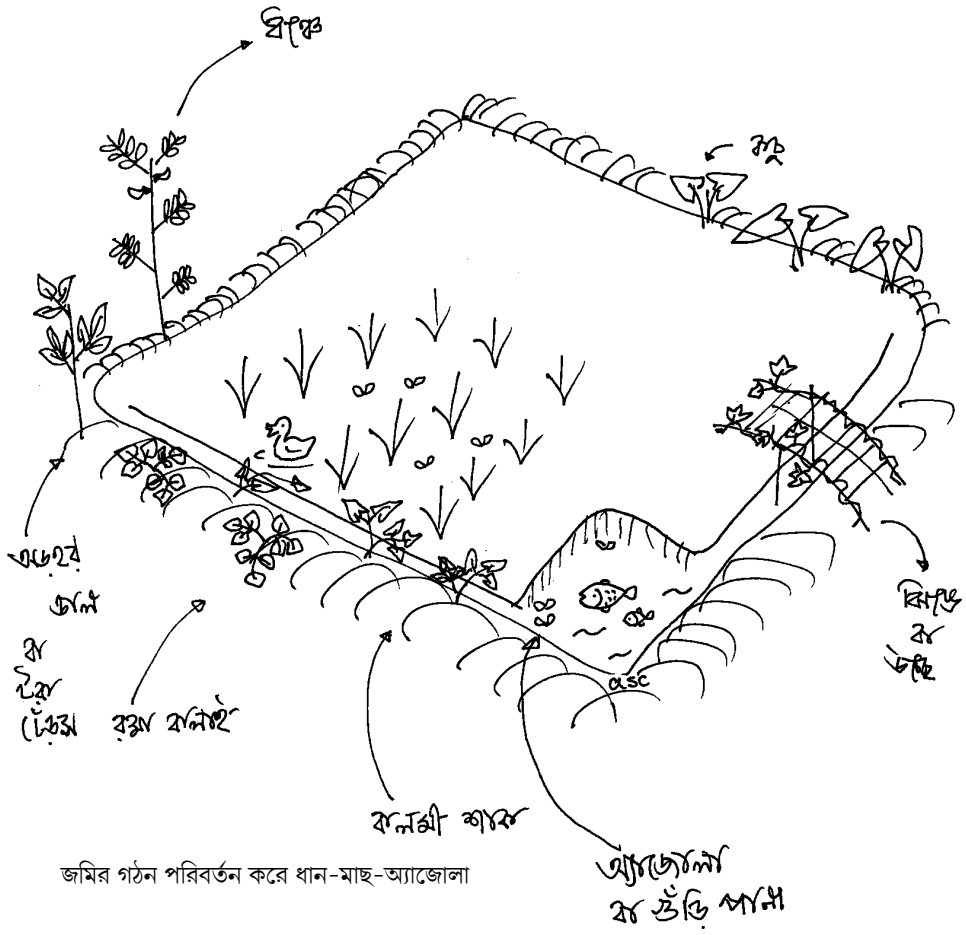

জমির গঠন পরিবর্তন করে ধান-মাছ-অ্যাজোলা

ভয়াল আয়লার তাণ্ডবে সুন্দরবনের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। এই ক্ষতির মধ্যে অন্যতম হল চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়া। এর ফলে ওই এলাকায় চাষবাস একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। পরে বৃষ্টিতে কিছুটা নোনা ধুয়ে যায়। কিন্তু এখনো জমিগুলি আগের অবস্থায় আসেনি। এখনো জমিতে নোনা রয়ে গেছে। ফলে এবছরও ওইসব জমিতে ফসল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমরা এই কথা মাথায় রেখেই নোনা সহ্য করতে পারে এরকম কয়েকটি দেশি ধান সংগ্রহ করছিলাম। এগুলি হল তালমুগুর, মরিচশাল, কুমড়োগোড়, কামিনী, নোনাশ্রী, ঘুনসি, শোলের পোনা, ঘেউস, হোগলা, গেঁতু ইত্যাদি। এই খরিফে আমরা ওপরে উল্লেখ করা ধানগুলি নিয়ে চাষের কয়েকটি পরীক্ষা করব।

একই সঙ্গে, ডাঙা জমি যেখানে নিকাশি ব্যবস্থা ভালো সেখানে শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের পরীক্ষা করা হবে।

* গোচি পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নিচু জমিতে এক কাঠি করে ধান লাগিয়ে আমন ধানের চাষ হয়। ধানের মিশ্র পরাগমিলন রোধ করে, বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। এতে সাধারণ পদ্ধতি থেকে বেশি ফলন পাওয়া যায়। এভাবে দেশি জাতের ধান চাষ করলেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। গোচি পদ্ধতি হল দেশীয় একটি পদ্ধতি যা চাষিরা নিজেরাই আবিষ্কার করেছেন। সেই কারণেই এইভাবে চাষ করার অর্থ হল লোকায়ত জ্ঞানকে টিকিয়ে রাখা।

কীভাবে এই পদ্ধতিতে চাষ করবেন: ধান বীজ বাছাই ও তা শোধনের পর ধলুয়া (চষা মাটি) পদ্ধতিতে বীজ বুনতে হবে। একবিঘা বীজতলার জন্য ১৪-১৬ কেজি বীজ ধান লাগে। বপনের ৩-৪ সপ্তাহ বাদে বীজতলায় আচড় ও মই দিয়ে চারার গোড়াগুলি ভেঙে দিতে হবে। আর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গোড়াগুলি ভেঙে যাওয়ার পরও কয়েকদিন পরে আবার নতুন করে চারা জন্মায়। এর ফলে চারা অনেক শক্তপোক্ত হয় যা বীজতলায় ভাদ্র মাস অবধি রাখা যায়। এক্ষেত্রে চারা রোপণের কোনো বয়স সীমা নেই। মূল জমিতে রোপণের সময় চারা থেকে চারার দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি রাখতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা কাজ, পদ্ধতি এবং সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অথবা চাষের সামগ্রী যেমন জীবাণুসার, বীজ ইত্যাদি পেতে চাইলে নিচের নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন ৯৪৩৩৩৯০৮২৯, ৯৮৩৬৯৫২৩৮১ ■■

ছবি : অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জি

চাষের জরুরি বই

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ চাষ নিয়ে ১০টা ছিপছিপে বই একসঙ্গে করে বার করেছে। এর মধ্যে ধান নিয়ে বই আছে, গম নিয়ে বই আছে, ডাল-আলু নিয়ে আছে, পাট-তেলবীজ, ভুট্টা, আখচাষ নিয়ে আছে, আবার কেঁচোসার-অণুখাদ্য SRI বা শ্রী পদ্ধতি নিয়েও আছে। ভালো চাষ ভালোভাবে শেখাতে এই বই।

এই বই দেখে বুঝতে পারি কৃষিতে খালি ক্ষতি হচ্ছে না, খালি ক্ষতি হলে ভালো চাষের জন্য এই বই প্রকাশ পেত না। এই বই দেখে বুঝতে পারি চাষ এগোচ্ছে, মাঠের অভিজ্ঞতা সূচিবদ্ধ হচ্ছে।

ধানে জমি বাছাই, বীজ বাছাই, বীজ শোধন, বীজতলা তৈরি নিয়ে বিস্তারিত আছে। ধানের জাত ফি মরশুমে সেচসেবিত জমিতে কী, বৃষ্টি-নির্ভর নিচু-উঁচু জমিতে কী সে সবও বলা আছে। সার ও কীটনাশক নিয়েও সম্পূর্ণ কথা আছে। সঙ্গে বাড়তি আছে, কিছু জৈবসারের উদ্ভিদ- খাদ্যোপাদানের শতকরা পরিমাণ ও ২০০৬-০৭ অব্দি আমন-বোরো ফলনের সারণি। গম, ভুট্টা, ডাল, আলুতেও এইরকম সব তথ্য আছে। পাটে- তেলবীজেও তাই। আখ বলতে গিয়ে সঙ্গে আবার বেশ কিছু সাথি ফসলের কথা আছে। আইপিএমের কথাও আছে।

তবে রাসায়নিক সার কীটনাশকের ও উচ্চফলনশীলের কথা গুরুত্ব নিয়ে বলা আছে। যদিও আমরা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীলের পক্ষে না। বরং দেশি ধান, জৈবসার-কীটনাশক, আইপিএম, মিশ্র বা পয়রা নিয়ে বই হলে ভালো লাগত বেশি। ছোট জোতের কথা মনে রেখে সুসংহত চাষ, ল্যান্ড শেপিং ইত্যাদি নিয়ে বললেও ভালো হত।

আশা, আগামীদিনে এই উদ্যোগ সরকার নেবে। পুস্তকমালার পূর্বাপর তথ্য সংকলনের কাজ করেছেন শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান।

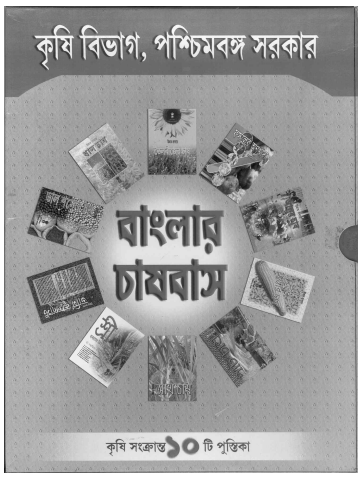

বাংলার চাষবাস।। অক্টোবর ২০০৮ সংস্করণ।। প্রকাশক : কৃষিবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ■■

নটে শাক

Amaranthus tricolor (Amaranthaceae)

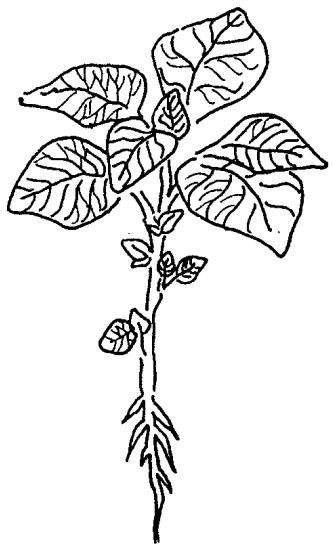

নটে শাক চাষ করতে হয় এই শাকের অনেক জাত। ডাঙা জমিতে আগাছা হিসেবেও জন্মায়। প্রায় সারাবছরেই পাওয়া যায়। গুল্ম জাতীয় গাছ। কাটোয়া ডাঁটা ও লাল নটের বীজ সাধারণত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ডাঙা জমিতে লাগাতে হয়। বর্ষার পরে ফুল ও বীজ হয়।

নটে শাক ভেজে বা তরকারি করে খাওয়া যায়। নটে বেশ সুস্বাদু। সহজে হজম হয়। হজম শক্তি বাড়ায়। পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কার করে, রক্ত পরিষ্কার করে। শিকড় বেটে নখকুনিতে লাগালে ব্যথা ভালো হয়। শিকড় বেটে গরম জলের সঙ্গে খেলে বমি হয়ে বিষ বার করে দেয়।

কাটোয়া ডাঁটা যাকে বলে সেটাও নটে শাকের মতোই উপকারী।

আরও কয়েক রকমের নটে শাক আছে। তবে সব কটার গুণ প্রায় একই রকম। যেমন ১. লাল নটে ২. গোবরা নটে ৩. বাঁশপাতা নটে ৪. লাল বাঁশপাতা নটে ইত্যাদি।

আবার কতগুলি বিনা চাষে হয়। যেমন ১. টুনটুনি নটে ২. চিরু নটে ৩. ঘোন্টি নটে ৪. বন নটে ৫.কাঁটা নটে ইত্যাদি।

■■ সূত্র : বাংলার শাক

বিকল্প চাষের কিছু উদাহরণ

বলরামের কথা

কৃষক বলরাম মণ্ডল ল্যান্ড শেপিং করেছেন। ল্যান্ড শেপিং মানে জমির গঠন বদলে চাষ। কৃষকের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গয়াধাম গ্রামে। তিনি অন্নপূর্ণা কৃষকদলের সদস্য, দলে আছে ১০ জন, দল তৈরি হয়েছে ২০০২-এ।

কৃষকের পরিবারে পাঁচজন। দুই ছেলে-এক মেয়ে স্ত্রী ও তিনি। দুই ছেলে কাজের জন্য দূরে থাকে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

চাষ করেই তাঁর খাবার জোগাড় হয়। তবে ঘরামির কাজও করেন। এই কাজ হয় মাঝে মধ্যে।

কৃষকের বাস্তু ঘেঁষা জমি তিন বিঘে। ল্যান্ড শেপিং এই তিন বিঘেতেই। এই জমির চারপাশে নালা করে নালার মাটি দিয়ে জমি ঘিরে উঁচু করা হয়েছে। নালাকে যোগ করা হয়েছে পুকুরের সঙ্গে। কম্পোস্ট-কেঁচোসার বানিয়ে জমিতে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে জমিতে কাজ করেছেন। ল্যান্ড শেপিং -এর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থ সৃজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে।

জমিতে খরিফে ধান-রবিতে আলু হয়। নালায় হয় কচু। আলে দুই মরশুম সবজি হয়। খরিফে ট্যাড়শ -ঝিঙে, রবিতে পালং, মুলো, টম্যাটো। সবজি অনেকটাই বিক্রি হয়। বিক্রি করেন গঞ্জের বাজারে। সরাসরি বিক্রি। এই জন্য ভ্যান ভাড়া লাগে। গত মরশুমে কেবল কচুই বিক্রি করেছেন (২০০টি X ৪ টাকা) ৮০০ টাকার। এই কাজের জন্য ডিআরসিএসসি দিয়েছে ৩,৫০০ টাকা।

গৌরীর কথা

আর একজন গৌরী মণ্ডল। গৌরীরও বাড়ি একই জেলায়। ব্লক-পঞ্চায়েতও একই। তবে গ্রাম আলাদা, গ্রামের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। গৌরীর জমি বাস্তুতে ২ বিঘে ৫ কাঠা। অন্য জায়গায় আরো এক বিঘে আছে।

গৌরীর পরিবারে চারজন। স্বামী ঘরামির কাজ করেন, নৌকা বানানোর কাজ করেন। গৌরীর দল সূর্যকিরণ মহিলা দল, দলে ১৪ জন আছে। ল্যান্ড শেপিং করার আগে তাঁর মডেল বাগানি হিসেবে পরিচয় ছিল।

ল্যান্ড শেপিং হয় ২০০৭-এর খরিফে। বাস্তু লাগোয়া এক বিঘে নিয়ে কাজ হয়। জমির সঙ্গে থাকা পুকুরেরও এই সময় সংস্কার হয়। পুকুর কাটতে মুনিশ লেগেছিল। মুনিশের মজুরি ৫,১০০ (৬০ দিন X ৮৫.০০ রোজ) মাঠের বাকি কাজ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই করেছেন। ডিআরসিএসসি থেকে দেওয়া হয়েছিল ৬,১৫০ টাকা।

নালা কেটে আল উঁচু করেছেন। খরিফে জমিতে আমন ধান ও আলে করলা-ঝিঙে করেছেন। প্রাক্ খরিফে করেছেন পুঁই-ট্যাড়শ। সবজি সরাসরি বিক্রি করেন গঞ্জের বাজারে। এর মধ্যে বেশি বিক্রি করেছেন পুঁই শাক, প্রায় ৮ কুইন্ট্যাল, পুঁই কিলোতে ৩ টাকা করে পেয়েছেন। ■■

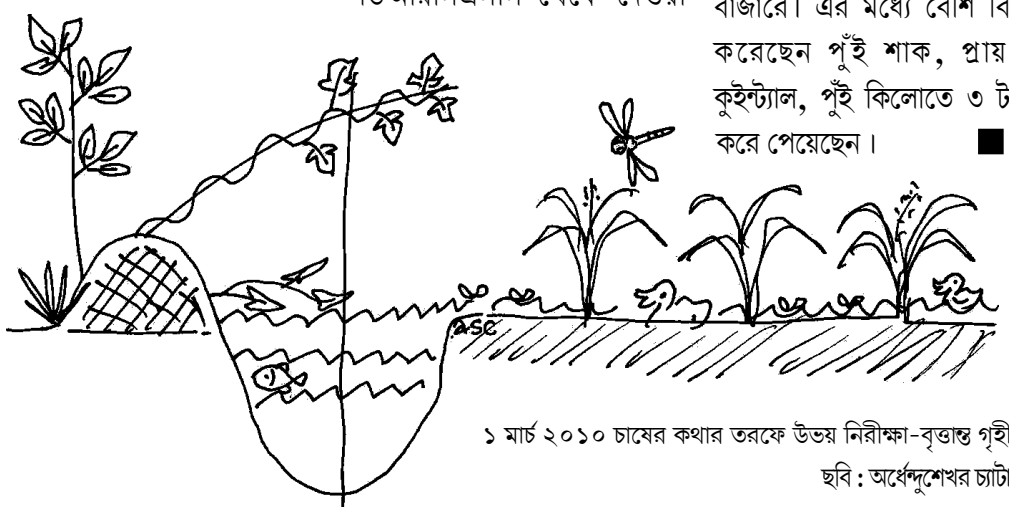

১ মার্চ ২০১০ চাষের কথার তরফে উভয় নিরীক্ষা-বৃত্তান্ত গৃহীত
ছবি : অর্ধেন্দুশেখর চ্যাটার্জি

পেট আছে গুদাম নেই

পৃথিবীর অর্ধেক ক্ষুধার্ত মানুষের বাস আমাদের এই দেশে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে পাশাপাশি খাদ্যের উৎপাদনও কমছে। এরকম অবস্থায় প্রায় ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন বা ৬৫০ কোটি কেজি গম খোলা আকাশের নিচে থেকে পচে যাচ্ছে পাঞ্জাবে। সরকারি অজুহাত, এই সব খাদ্যশস্য রাখার গুদাম নেই।

মন শান্ত

একী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে। সায়েন্স পত্রিকার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সংখ্যার ৭৬৭ পাতায় মনসান্টো স্বীকার করেছে, তাদের বিটি তুলোর পাতা খেয়েও 'পিঙ্ক বলওয়ার্ম' নামে একটি পোকা মরছে না। এ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম ভারতে।

বিটি তুলোর চাষ ভারতে ছড়ানোর জন্য এবং মনসান্টোর কোটি কোটি টাকা মুনাফার জন্য কোম্পানিটি বলেছিল, তারা বিটি নামের একটি ব্যাকটেরিয়ার জিন তুলোর জিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতে তুলো গাছে আর পোকা লাগবেনা। এখন বিটি বেগুন চাষ দাঁড়ানোর জন্যও পোকা না লাগার কথা বলছিল। তাদের এবং তাদের দেশীয় কিছু বশংবদ বিজ্ঞানীদের এই কথার ফানুস এখন ফুটো হয়ে গেল। আমাদেরও মন শান্ত হল।

জয় জওয়ান ক্ষয় কিষান!

আমাদের সাফল্যের প্রধান নায়করা হলেন ভারতের চাষি। তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভারতে খাদ্যের নিরাপত্তা এসেছে। ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী গত বছর অর্ন্তবর্তী বাজেট পেশের সময় একথা বলছিলেন। এবার বাজেট পেশের সময় এই বাজেট হল 'আম আদমি'র, চাষির, কৃষিজীবীদের।' সুতরাং বছর বছর যে চাষিদের উপকারে অনেক প্রকল্পই থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। এবার দেখা যাক চাষিদের জন্য কেমন বাজেট হল!

বাজেটে সব মিলিয়ে ৫ লক্ষ কোটি টাকার কর ছাড় দেওয়া হল বড় বড় শিল্পপতিদের, থুড়ি কর্পোরেট চাষিদের। একই সঙ্গে খাদ্যের অপচয় রুখতে সরকার ঋণ দেবে বলে ঠিক করেছে। খাদ্যের অপচয় রোখা মানে হল ওই কর্পোরেট চাষিদের খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করার জন্য ঋণ। কোল্ড স্টোরেই জন্য। বলা হল চাষিদের ২৫ কোটি টাকা অবধি ঋণ দেওয়া হবে। এর থেকে যদি ঠান্ডা রাখার মেশিন বা মাল বওয়ার জন্য তৈরি হয় তবে কোনো ডিউটি লাগবেনা। কোন্ প্রান্ত চাষি শস্য মজুতের জন্য ঠান্ডা রাখার মেশিন এবং ট্রাক কিনবেন বা ২৫ কোটি টাকা ঋণ নেবেন।

রক্ত বীজ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নয়া বীজ বিলের অনুমোদন দিল। বিলের নাম 'বীজ বিল ২০০৪'। এর ফলে 'বীজ আইন ১৯৬৬' বাতিল হবে। তার জায়গায় বসবে এই বিল।

সরকার বলছে, এর ফলে সেরা বীজে সেরা চাষে চাষির ভালো হবে। বলা ভালো, এই নিয়ে চারবার মন্ত্রীসভা এই বিলের অনুমোদন দিল। বলা ভালো, এই নিয়ে তিনবার সংসদ এই বিল বাতিল করল। ২০০৪-এ এই বিল রাজ্যসভা থেকে সংসদের কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গিয়েছিল চুলচেরা বিচারের জন্য। ২০০৬-এ কমিটি এই নিয়ে রিপোর্ট দেয়। তারপর এই অনুমোদনের পালা।

তামাম দেশের তামাম কৃষক এই নয়া বিল নিয়ে অগ্নিশর্মা। আপাতত সবার চোখ এখন সংসদ ভবনের দিকে।

তুলো না হীন!

মনসান্টোর বিটি তুলো কীটনাশক তাড়াতে পারল না। তাড়াতে পারল না গুজরাটে। গুজরাটের আমরেলি, ভাবনগর, জুনাগড় ও রাজকোট জেলায় মনসান্টো বিটি তুলো লাগিয়েছিল। তুলোর পয়লা শত্রু পিঙ্ক বোল ওয়ার্ম, আর এই পোকা তাড়াতেই এই বিটি। কিন্তু দেখা গেল বোল ওয়ার্ম জমিতে যেমন আসত তেমনই আসছে। মনসান্টো নিজেই এসব নজর করেছে। মনসান্টো নিজেই এসব স্বীকার করেছে। বিটি-প্রতিবাদী দেবিন্দর শর্মা একে মনসান্টোর অভিসন্ধি বলেছেন। বলেছেন, এইভাবে পাকে পাকে জড়িয়ে দেশের তুলো চাষিকে মনসান্টো মারছে। আর এক প্রতিবাদী কবিতা কুরগান্তি বিটি বেগুনের কথা মনে করিয়ে, এর থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

বন্য কমপিউটার

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। বনসংক্রান্ত জ্ঞান-এর সংরক্ষণে, বন বিষয়ক তথ্যের বিনিময়, দাবানলের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিতকরণ ও তার ওপর নজরদারি এবং বনের জিনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার জোর দেওয়া হবে বলে ওই মন্ত্রকসূত্রে জানানো হবে। এর ফলে ভূমির গঠন, বনের প্রকৃতি এবং তার বিস্তার, বনের প্রাণী, উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সমূহের তথ্য নাগরিক সহজেই পাবে বলে মন্ত্রকসূত্রে জানানো হয়েছে।

ওয়ানওয়ার্ল্ড, নেট

অরণ্যে রোদন!!

২ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে বন অধিকার আইন বা ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট ২০০৬-এর। অথচ প্রায় ২৫ লক্ষ অধিকার ধারক এই অধিকারের জন্য আদেশ করলেও, মাত্র ৫ লক্ষ আবেদনই এখনো অবধি নিস্পত্তি হয়েছে। প্রশাসনের এই দীর্ঘসূত্রিতা এবং বন ব্যবস্থাপনা কেমন চলছে তা খতিয়ে দেখতে, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির মেয়াদ হবে তিনমাস। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আইনটি লাগু হওয়ার পর থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে সমস্ত অধিকার ধারকদের আবেদনের নিস্পত্তি হওয়ার কথা ছিল।

পায়োনিয়ার

আক্রান্ত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বার্ষিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হচ্ছে, সেদেশে নাগরিকদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হল কীটনাশকের বিষক্রিয়া। ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে ৭৪৩৮ জন মারা গেছে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায়। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, সাধারণত সবজি চাষে ব্যাপক কীটনাশক প্রয়োগ এই মৃত্যুর কারণ।

Globalgoodnews.com

পাটরানি

পাটশাক আর্সেনিক বিষক্রিয়া লাঘব করছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের একদল গবেষক এমন দাবি করছেন। আর্সেনিক চিকিৎসায় যে ওষুধের প্রয়োগ হয়, সেই ওষুধে নিরাময়ের তুলনায় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বেশি। নিয়মিত খাওয়ার চল থাকলে শরীরে আর্সেনিক হানায় পাটশাক ডিএনএ-র ক্ষতি প্রতিরোধ করে। এই খবর এল ডাউন টু আর্থ সূত্রে।

একটু জল পাই কোথায়...

ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ ইঙ্গিত দিয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে ভারতে জল নিয়ে ত্রাহিরব উঠবে। গ্রুপের হিসেব, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে জল-ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। ১৯৯৯-এ একই কথা শুনিয়েছিল ন্যাশনাল কমিশন অন ইনটিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ডেভলপমেন্ট।

গ্রুপের পূর্বাভাসে ২০৩০-এ দেশে জলের চাহিদা হবে বছরে ১৫০০ ঘন কিলোমিটার, অথচ পাওয়া যাবে তার অর্ধেক, ৭৪৪ ঘন কিলোমিটার। তবে মরশুমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করলে এই পরিমাণ হবে ৩৮৪০ ঘন কিলোমিটার, মানে প্রয়োজনের দ্বিগুণ। চাহিদা মেটাতে সেই জল জমিয়ে ঠিকঠাক সরবরাহ করতেও হবে। ভারতে বৃষ্টি হয় কমবেশি চার মাস। মোট বৃষ্টির ৮০ ভাগই এই সময়ে হয়। যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া এই জল জমিয়ে বারোমাস খরচ বেশ কঠিন। ■■

সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত ¯া কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৮২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc@vsnl.com, www.drcsc.org
DL No. 92/3.11.95